BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 135-153

বাংলাভাষা নিয়ে সংঘাত : ইতিহাসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

অমল কুমার গাইন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : amalgain75@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মানবসভ্যতার বিবর্তনে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা নানা দিক থেকে গভীর সম্পর্ক-সূত্রে বাঁধা। শৈশবে মায়ের মুখ থেকে শুনে ভাষার প্রথম পাঠ নেওয়া হয় বলেই বোধ হয় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সে ভাষার পরিচয় মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা। 'বিলেতি বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে, 'ভাষা তার আপন শক্তিতে জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাষিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সংহতি রক্ষা করে থাকে।'[১] আধুনিককালে অন্তর্নিহিত ঐক্য ছাড়াও জাতিসত্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নির্দিষ্ট ভাষিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে বহুভাষিক-বহুজাতিক রাষ্ট্রে ভাষা কখনো জাতি-জাতীয়তার পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত কম নেই, বাংলা ভাষা তার মধ্যে একটি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভাষিক চেতনা বাঙালির মুক্তির প্রেরণা হয়ে ওঠে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল ভিত্তিটাই হলো এই ভাষা।

মূলশব্দ
বাংলা ভাষা, বাঙালি, ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষা, জাতীয়তাবাদ

উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বাঙালির বহুল উচ্চারিত কথা : 'ভাষা থেকে ভূখণ্ড' কিংবা ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলন, বিশেষ করে বায়ান্নোর আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণি, মূলত তরুণদের মধ্যে এখনো প্রবল আবেগ ও আগ্রহ রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিই এই ভাষা আন্দোলন। কিন্তু যে ভাষা নিয়ে শিক্ষিত বা তরুণ সমাজে এত আবেগ, তার অতীত কেমন ছিল এটাও জানা আবশ্যক। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ছিল না। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল চল্লিশের লাহোর প্রস্তাবের পরই, যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালি। ১৯৫২তে ঘটে তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। কিন্তু তার বহু পূর্বে বাংলা ভাষার অবস্থা কেমন ছিল যে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলো ফেলাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

ভাষা আন্দোলন নিয়ে বেশকিছু গবেষণাধর্মী বই এবং দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বেশকিছু প্রকাশনাতে বিশেষ করে বশির আল হেলাল, বদরুদ্দিন উমর, এম আর আখতার মুকুল, নিগার চৌধুরী প্রমুখের প্রকাশনাতে বাংলা ভাষার দৈন্যদশা এবং সোনালি সময়ের কথা উঠে এসেছে। সেইসব গবেষণা এবং প্রকাশনার কিছু কিছু তথ্য এই লেখনিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা পত্রটি লিখতে গিয়ে মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বই এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বাঙালি জাতি তার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই উপমহাদেশে সর্বজনস্বীকৃত। বাঙালিকে যারা আত্মবিস্মৃত জাতি মনে করেছে, তারাই বাঙালির কাছে বিস্মৃত হয়েছে। আর এই ভুলটাই করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা অস্বীকার করে।

বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠির শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষাকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা বা উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেয়ার অশুভ ইচ্ছা জিন্নাহর একক মস্তিস্কপ্রসূত ব্যাপার বা কোনো অপরিকল্পিত ইচ্ছার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এ ষড়যন্ত্র অনেক পুরানো। পাকিস্তানের জন্মের বহু বছর পূর্বে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিলো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নবীন ও প্রবীণের চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশের সাথে সাথে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব। চল্লিশের দশক যেমন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় এক দিক থেকে প্রগতির দামাল দশক, অন্যদিকে রাজনৈতিক এবং অংশত সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার যুগ। লাহোর প্রস্তাবের ফলে একদিকে বাংলার তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের মাঝে প্রতিভা বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিলো, অন্যদিকে প্রাচিনপন্থীরা এঁদের পথ রোধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাঙালি যখন একটা স্বতন্ত্র শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলো তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরিরা ঘোষণা করেন, এক আল্লাহ, এক কোরআন, এক রাসূলের অনুসারি মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির দেশ।[২] বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অদূরদর্শিতা, হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদিতা, বিপ্লবীদের ধর্মীয় চেতনা, মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর সম্প্রদায়বাদী দ্বিজাতিতত্ত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদী এই রাজনীতির কাজটা সহজ করে দিয়েছিলো। এর সঙ্গে কংগ্রেসের কিছু নীতিগত ভুলভ্রান্তি মুসলিম লীগের রাজনীতিকে

মুসলমান জনতার দাওয়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এসব কারণে হাতে গোনা কয়েকজন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের পক্ষে ধর্মবাদী রাজনীতির জোয়ার ঠেকানো সম্ভব ছিলো না, ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পূর্ববাংলায় স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠুক পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টাদের সেটা কোনোভাবেই কাম্য ছিলো না। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি মাথা তুলে দাঁড়ালে তাঁদের শাসন-শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে প্রথম থেকেই তারা সচেতন ছিলো যাতে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির বিকাশ না ঘটে। এ কারণে তারা প্রথম থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করে। আর বাঙালি সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষা প্রশ্নে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিতর্ক বা ষড়যন্ত্র উনিশ শতকে হলেও মধ্যযুগেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। বলা যেতে পারে পাল আমলের পর থেকে বাংলা ভাষা অবজ্ঞার শিকার হতে থাকে। বস্তুত পালদের পরে বাঙালির বাংলা একপ্রকার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ অবাঙালি সেনদের শাসনামলে বাংলা যে উপেক্ষার স্বীকার হতে শুরু করলো তা মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে বেশ প্রকট রূপ ধারণ করে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এর সাথে যুক্ত হয় ষড়যন্ত্র। যার সমাপ্তি ঘটে বায়ান্নোর সংগ্রামে বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে বাংলাভাষাকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হয় সেটা ছিল লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে, যেটি সীমাবদ্ধ ছিল একশ্রেণির সাহিত্যচর্চাকারীদের মধ্যে। বাংলা তাদের ভালো লাগে না, বাংলায় লেখা উচিত কি-না এসব ভেবে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে এ সময়ে বাংলা এমন কোনো বিপদের সম্মুখিন হয়নি। সাধারণ মানুষ তাদের মতো করে বাংলা ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগে বাংলাভাষার এই সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সেসময় বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম লেখকরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন। যেহেতু ধর্মীয় গুরুরা বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেহেতু, তাদের মত অনুসারে আরবি-ফারসিতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে।[৩] কিন্তু বাস্তবতা ছিলো ভিন্ন, কেননা যাদের জন্য সাহিত্য রচনা-সেই পাঠকসমাজ বাংলা জানতেন, তারা বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বুঝতেন না। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে লেখকসমাজকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিলো। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকদের কি পরিমাণ অবজ্ঞা ছিল তা নিম্নোক্ত কবি সাহিত্যিকদের রচনার দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়-

১৫৮৪ সালে কবি সৈয়দ সুলতান লেখেন-

> 'কর্মদোষে বঙ্গে'ত বাঙালি উৎপন
> না বুঝে বাঙালি সবে আরবী বচন।

আপনা দ্বীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
সে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছেত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবেত কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি
মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যতেক মনের কথা কহিনুকাহাররে'।[৪]

পাঠকসমাজ আরবি বোঝে না সেজন্য তাঁকে বাংলায় লিখতে হচ্ছে বলে কবি সৈয়দ সুলতান দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তেমনই সপ্তদশ শতকে আরেক বাঙালি কবি মুতালিব বাংলায় লিখতে যেয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন–

'আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছ এ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পূণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লাহ পাপ ক্ষেমিবেক।'[৫]

ষোড়শ শতকের আরেক কবি মুজাম্মিল বলেন–

আরবীর ভাষা লোকে না বুঝে কারণ
দেশীভাষে কইলুঁ তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকে কবিলুঁ লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না যায়ে খণ্ডন।

তিনি আরো লিখেছেন–

আরবী বচন
বঙ্গদেশীগণ
সবে না বুঝে বিশেষ
নিজ দেশ বুলি
ভনিলুঁ পঞ্চালি
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে[৬]

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রাচীনতর কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০) ভয় যেন তবু কিছুটা কম। তিনি বলেন-

নানা কাব্যকথা রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আক্ষি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।[৭]

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও প্রথমোক্ত কবি সৈয়দ সুলতান মাতৃভাষাকে অমূল্য রতন বলেও উল্লেখ করেছেন–

'যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।'[৮]

এখনে কবি তাঁর ভেতরের সমস্ত ভয় ও দ্বিধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিম শুধু ভয়-ভীতি-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রমই করেননি, মাতৃভাষার প্রতি তিনি সেই কালে দেখিয়েছেন তাঁর পরম শ্রদ্ধা। বরং যারা বাংলা ভাষাবিরোধী তাদের তীব্র ও কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পংক্তিগুলি-

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে শয়ে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।[৯]

মধ্যযুগে বাঙালি লেখক, কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এই যে দ্বিধা-সংশয় তা কেবলমাত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে, সেখানে জাতি হিসেবে বাঙালিকে ধ্বংস বা হেয় করার কোন প্রবণতা ছিলো না বললেই চলে। সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। তখন তুলনাবিচার হতো আরবি-ফার্সির সাথে বাংলার, যেখানে ধর্মই ছিল প্রধান বাধা। ধর্ম ও তার ভাবান্দোলন যেমন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে ঠিক তেমনি তার

কঠোর নৈতিক প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যের প্রস্রবণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে ভাষার ক্ষেত্রে শুধু ধর্মই আসেনি, জড়িয়ে গেছে উচ্চশ্রেণির স্বার্থের প্রশ্নটি। ১৮৭০ সালের আগে শিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণির বাঙালি মুসলমানরা ফারসির মোহে মোহগ্রস্ত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ছিলো খুবই সীমিত। পরবর্তী সময়ে উর্দু সেই স্থানটি দখল করে নেয়।[১০]

সমস্যাটি জটিল হয়ে ওঠে প্রধানত ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি (চল্লিশের দশকে) সময়ে ব্রিটিশ সরকার রাজকার্যে ফার্সির স্থলে ইংরেজির ব্যবহার শুরু করলে সেটা হিন্দু মুসলিম উভয়ের জন্য সমস্যা রূপে দেখা দেয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়, সাথে উর্দুও যুক্ত হয়। হিন্দুরা অতি দ্রুত এই সমস্যা মোকাবিলা করেন ইংরেজি শিখতে শুরু করে। তাঁদের কাছে ফার্সি যা ছিল, ইংরেজিও তাই ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এই পরিবর্তনকে মনে করলেন তাদের বিরুদ্ধে জাতি-বিদ্বেষ এবং ধর্ম-বিদ্বেষ হিসেবে। ফলে তাঁদের সমূহ ক্ষতি হল। তারা ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার নীতি গ্রহণ করে শুধুমাত্র চাকরিতে রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে পড়লেন তা নয়, উনিশ শতকে চিন্তা, শিক্ষা, জ্ঞান ও ভাবের যে বিপুল জাগরণ ও উন্নতি হলো তাতে মুসলমানদের আর স্থান রইল না। শুধু তাই নয় দিন দিন তারা ইরেজদের বিরাগভাজনও হতে থাকে। কখনও কখনও রোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের পরে দেখা যায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটনের কারণে ইংরেজদের নির্যাতন, নিগ্রহ ও বঞ্চনায় পরিণত হয়েছে। এর পিছনে কারণ ছিল তাদের ইংরেজ বিদ্বেষিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা বিমুখতা।

মুসলমানদের এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রবাদ পুরুষ– একজন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) অন্যজন বাংলার ফরিদপুরের নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)। সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সৈয়দ আহমদ এবং নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় বহুদূর পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কোনো আন্তরিকতা ছিলো না। সৈয়দ আহমদ নিজের মাতৃভাষা উর্দুকে উপেক্ষা করতে পারেননি অন্যদিকে বাংলার সন্তান নবাব আব্দুল লতিফের বাংলা ভাষার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিলো না। সরকারের নিকট এক প্রতিবেদনে নবাব আব্দুল লতিফ উল্লেখ করেন, অভিজাত বাঙালি মুসলমানদের জন্য উর্দু এবং নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বাংলাকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে বাংলায় যথেষ্ট আরবি-ফারসি থাকা বাঞ্ছনীয়।[১১]

১৯০৩ সালে সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর'পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে হিন্দুগণের ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১২]

১৯১৫ সালে 'আল এসলামে'র লেখক এই ধরনের মনোভাবকে নিন্দা করে বলেছেন– 'মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙালি হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া,

কিম্বা বাংলা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা-এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণির মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়।'[১৩]

কিন্তু ইনি আবার আরবি হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করে বলেন, 'উর্দ্দু, ফারসি ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়া মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমনকি অনেক বাঙালি মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন। ...আমাদের মাতৃভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশি হইবে।'[১৪]

১৯০৩ সালে 'নবনুরে' আবার বলা হয়, 'বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।'[১৫]

১৯১৫ সালে 'কোহিনূরে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন– 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপি জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।'[১৬]

১৯১৬ সালে 'আল এসলামে' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন– 'জীবিতা বাংলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দ্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিবার যতই চেষ্টা হোক উর্দ্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়ে রাখা যাইবে না।'[১৭]

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্গে মোসলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[১৮] এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, হিন্দু শাসকদের আমলে অনেকটা ঘৃণিত বাংলা ভাষা মুসলিম শাসন আমলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং এ আমলে যে বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো তা বলা যেতে পারে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে বাংলা যখন দিল্লি থেকে স্বাধীন হয়ে যায় তখন তাঁরা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁরা। একইভাবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ আরবি ও ফার্সির পাশাপাশি বাংলাকেও বেশ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরা যে বাংলাকে ভালোবেসে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এমনটি মনে হয় না। এর পিছনে রাজনৈতিক ব্যাপারটিও ছিল যথেষ্ট। আর তা হলো, ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির (হিন্দু মুসলিম উভয়) আনুগত্য লাভ করা। যাইহোক, তাঁর আমলেই মহাভারত বাংলায় অনুদিত হয়। আবার সেই যুগেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম, যাঁকে কেন্দ্র করে বাংলায় ভাববাদী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, আর এই ভাববাদী সাহিত্য বাংলা ভাষাকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল ভক্তিধর্মের প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল। কাজেই দেখা যায়, যে সুলতানি আমল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পৃষ্ঠপোষকতা

করেছিল- পরবর্তী মোঘল আমলে তা আর হয়নি। সাহিত্য ও সরকারি কাজকর্মে তারা ফার্সির ব্যবহার বজায় রেখেছিল। তার উপর সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে উর্দু ভাষার চর্চা বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আবার ইরানের সাফাভি বংশের পতনের ফলে বহু শিয়া মুসলমান দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন, তারা এসে ফার্সির প্রভাবকে বিস্তৃত করেছিলেন, এ ধারা অব্যাহত ছিল ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশরা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিসিয়াল ভাষা করলে ফার্সির এই জায়গাটা দখল করে নেয় ইংরেজি। তবুও ফার্সি ও উর্দুর ব্যবহার কমেনি বরং উচ্চশ্রেণির মধ্যে ব্যবহার বেড়েছিল। কাজেই বলা যায়, যে উচ্চশ্রেণির হাতে এক সময় বাংলার প্রসার পরবর্তী সময়ে সেই উচ্চশ্রেণির বাঙালিরাই উর্দুকে মনে করতে থাকে অভিজাতদের ভাষা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগে কবি সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে ভয় পেতো, কেননা ধর্ম ছিল প্রধান বাধা। তবে কোনো কোনো কবি-সাহিত্যকরা সে ভয়কে অতিক্রম করে বাংলা ভাষায় কাব্য এবং সাহিত্যচর্চা করেছেন। 'বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা এবং এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করবে হিন্দুরা' এই মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে যখন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হতে থাকে। ফলে দেখা যায় বিংশ শতাব্দির শুরুতেই উল্লিখিত বুদ্ধিজীবীরা উর্দুকে বাঙালির মাতৃভাষা করার বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ করতে থাকে এবং বাংলার পক্ষে সোচ্চার দাবী করে। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৮ সালে 'আল এসলাম' পত্রিকায় তিনি বাংলাকে শুধু মাতৃভাষা নয় জাতীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার গুরুত্ব যুক্তিসহকারে তুলে ধরেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তান জন্মের অব্যবহিত পূর্বে ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, সেটি বাংলায় সাহিত্য চর্চা পাপ না পুণ্য, বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা হবে কিনা তা নয়। প্রশ্নটি হলো, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেই নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? আর তা এই কারণে যে, কথিত রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি তাদের মুখের ভাষা বাংলা। কিন্তু রাষ্ট্রের নেতৃত্বস্থানীয় যারা তাদের অধিকাংশই উর্দুভাষী অবাঙালি। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে ঐ সব উর্দুভাষী অবাঙালিরা বাঙালির মুখে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলো উর্দু। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মোহাম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদসহ আপামর জনতার আন্দোলনে নস্যাৎ হয়ে যায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রনেতাদের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অভিলাষ।

পাকিস্তানের গঠন যখন আসন্ন তখন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে বলেন- 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা (আজাদ, ১৯মে ১৯৪৭)।[১৯] এরপরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদও উর্দুর পক্ষে মত প্রকাশ করেন (জুলাই, ১৯৪৭)। এর তীব্র প্রতিবাদ করেন বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। দৈনিক আজাদে তিনি 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' নামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেন- ড.জিয়াউদ্দিন

আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইহা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক এবং নীতিবিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।[২০] তাঁর মতে, উর্দু জনগণের ব্যবহারিক ভাষা হতে পারে, তবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কখনোই নয়। ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে 'দৈনিক আজাদ ও ইত্তেহাদে' জনাব আব্দুল হক (বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের সাবেক পরিচালক) বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মূলকথা ছিলো, গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যা বিচারে বাঙালি সংখ্যাগুরু। কাজেই বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ।[২১] ২৭ জুন ১৯৪৭ সালে 'মিল্লাত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়- মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্যকোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছুই থাকতে পারে না...।[২২] ড. মোহাম্মদ এনামুল হক লেখেন- 'উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু' (মাসিক "কৃষ্টি')। ড. কাজী মোতাহার হোসেন লেখেন- 'যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু- মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে তা ব্যর্থ হবে'। তাঁর মতে, বাংলা এবং উর্দু উভয়েই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ।[২৩] সৈয়দ মুজতবা আলী তো ভাষাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেললেন-"পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে চেষ্টা করবে- ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে"।[২৪] এভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) পরে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বাঙালি শিক্ষক, সাহিত্যিকের একাংশ এবং মুসলিম লীগের বাঙালি রাজনীতিকরা প্রায় সবাই বলতে থাকেন, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। মাওলানা আকরাম খাঁর মতো সাংবাদিক-লেখক যুক্তির মারপ্যাচে বলেন, পূর্ববঙ্গে বাংলা এবং কেন্দ্রে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়াই সঙ্গত।

একদিকে পাকিস্তানের প্রতি মোহ, অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি মমতা– এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভুগেছে পাকিস্তানি বাঙালি মুসলমানসমাজ, যা অনেকটাই সুস্থ বাঁক নিয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে। তখন থেকে শুরু হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মুক্তিস্নানের প্রক্রিয়া। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত একটা জরিপ করলে দেখা যাবে যে, এই সময়ের মধ্যে একমাত্র ছাত্রসমাজই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে একতরফা সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক এবং পেশাজীবীদের মধ্যে ছিলো বিভাজিত সমর্থন। তবে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সবই ছিলো বাংলার পক্ষে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অল্পসংখ্যক মানুষের লেখা বিবৃতির মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী ধীরগতিতে এগুতে থাকে। কেননা তখন উর্দু সমর্থক সংখ্যায় কম ছিলেন। সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীমহলে উর্দুর পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বিপরীতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিস, ছাত্র ফেডারেশন এবং নেপথ্যে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কাজ করতে থাকে। তমুদ্দুন মজলিস (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করে। এতে মজলিস প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আবুল কাশেমসহ ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মুনসুর আহমদ বাংলা ভাষার পক্ষে লেখেন।[২৫] এ সময়ে একাধিক দল-মতের ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। তবে তমুদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলো সাপ্তাহিক মিল্লাত, দৈনিক আজাদ, সওগাত, দৈনিক ইত্তেহাদ ইত্যাদি। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার বাহন এই সব পত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের সাথে সাথে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে তোলে। পাশাপাশি উর্দুর মতো একটা শেকড়হীন ভাষাকে এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ভাষার অধিকারী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিলে কী পরিণাম হতে পারে, তার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সাতচল্লিশ সালের শেষদিকে বাংলাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় সরকারি এনভেলাপ, ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড, মানিঅর্ডার ফরম ইত্যাদি ছাপা হলো। এর প্রতিবাদে সরকারি কর্মচারি ও ছাত্ররা সভা ও মিছিলের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্লোগান ওঠে-'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'উর্দুর সাথে বিরোধ নাই' 'সব কিছুতে বাংলা চাই'। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মাথায় প্রথম বিক্ষোভ (নভেম্বর ১৯৪৭) হয়। এরপরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (২৭ নভেম্বর, ১৯৪৭) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ঢাকায় ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিক্ষোভ করে।[২৬] শুরু হয় সভা, সমাবেশ, মিছিল। এভাবে একের পর এক সরকারি পদক্ষেপ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে উসকে দিচ্ছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী চেতনার শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালির মধ্যে যখন ভাষিক চেতনা বিকশিত হতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গণপরিষদে উত্থাপিত একটি সংশোধনী প্রস্তাব ভাষার উপর আবার আঘাত হানে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। গণপরিষদে কুমিল্লার সাংসদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালির ২৯নং ধারার ১নং উপধারা সম্পর্কে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত ধারাটি সংশোধন করে ইংরেজি ও উর্দুর

পাশাপাশি গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলাকেও সমমর্যাদা প্রদানের দাবি করেন।[২৭] ২৫ ফেব্রুয়ারি উক্ত প্রস্তাবের উপর জোরালো তর্ক-বিতর্ক হয় এবং শেষপর্যন্ত কণ্ঠভোটে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। প্রস্তাবটির উত্থাপনকারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, তিনি প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে এ প্রস্তাব করেননি। পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ অধিবাসী যেহেতু বাংলা ভাষায় কথা বলে, সুতরাং বাংলাই হওয়া উচিৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, 'পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, এর সাধারণ ভাষা মুসলমান জাতির ভাষাই হবে, অর্থাৎ উর্দু। একমাত্র উর্দুই পারে পাকিস্তানের দুই অংশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করত'।[২৮] তাঁর মতে, উক্ত বিষয়টি পরিষদে তোলাই ভুল হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নির্লজ্জের মতো নিজের ইচ্ছাকে জনগণের অভিমত বলে চালিয়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, 'পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চায়। বাংলাকে সরকারি ভাষা করার কোনই যুক্তি নেই। তবে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে যথাসময়ে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে।'[২৯]

এরপরে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে সিন্ধুর এম এইচ গাজদার বলেন, 'প্রস্তাবটিকে বাইরে থেকে নির্দোষ মনে হলেও পাকিস্তানের পক্ষে এ বিপজ্জনক।'[৩০]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজনফর আলী খান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'পাকিস্তানের একটি মাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। আমি আশা করি অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানি ভালোভাবে উর্দু শিক্ষা করে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে। উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।'[৩১]

প্রস্তাবের পক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন কংগ্রেস দলের অস্থায়ী সদস্য শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন গণপরিষদের কংগ্রেস দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়, এটি উপরতলার কিছু মানুষের ভাষা। পূর্ববাংলা এমনিতে রাজধানী করাচি থেকে অনেক দূরে তার উপর তার ঘাড়ের উপর একটা ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাকে গণতন্ত্র বলে না।'[৩২]

যাইহোক গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাঙালির বাংলাবিরোধী ভূমিকায় এবং অবাঙালি সদস্যদের ভোটে উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এভাবেই জাতীয় চেতনাবোধ, দূরদৃষ্টির অভাবেই বাঙালি রাজনীতিবিদরা পরিষদে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করে স্বজাতি এবং মাতৃভাষার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা

করার দাবী উত্থাপন করেন, তখনও উপমহাদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হানাহানি অব্যাহত ছিল। ধর্মান্ধ ও মৌলবাদিদের দাপটে রাজনীতি বিপর্যস্ত এবং সমাজজীবন কলুষিত। এমনসময় বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সদস্যরা হয় নিশ্চুপ আর না হয় উর্দুর পক্ষে। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের কাঠামোটি একবার দেখা যাক :

পূর্ববঙ্গ	: ৪৪
পশ্চিম পাঞ্জাব (৪ টি মোহাজের আসনসহ)	: ২২
সিন্ধু (১টি মোহাজের আসনসহ)	: ৫
সীমান্তপ্রদেশ	: ৩
সীমান্ত রাজ্যসমূহ	: ১
বেলুচিস্তান	: ১
বেলুচিস্তান রাজ্যসহ	: ১
ভাওয়ালপুর রাজ্য	: ১
খয়েরপুর রাজ্য	: ১
মোট	: ৭৯[৩৩]

এ খবরে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ধর্মঘট আহবান করে। বিক্ষোভ ঢাকাসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপি সফল ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ, মিছিল প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষার প্রশ্নে জনগণ ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর ভুবনমোহন পার্কে কাজী জহিরুল হকের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সেখানে বাংলাতে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্ররা বক্তব্য রাখে। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর নওগাঁয় সিরাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুর কলেজ (বর্তমানে ব্রজলাল কলেজ) ছাত্রলীগের আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। সেখানে আমজাদ হোসেন, ধনঞ্জয় দাশ, মনসুর আলী, জগদীশ বসু প্রমুখ ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন (দৈনিক আজাদ ১ মার্চ ১৯৪৮)। ঐ দিন বিকেলে শহরের গান্ধীপার্কে (বর্তমান শহিদ হাদিস পার্ক) প্রায় দুইহাজারের অধিক লোকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছদরুদ্দিনের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয় মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্মঘট পালন করে। এছাড়াও ধর্মঘট পালিত হয় যশোর, ভৈরব, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, মেহেরপুর, পাবনা, জামালপুরসহ সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে। প্রতিটি জনসভার মূল বক্তব্য ছিলো বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া। পাশাপাশি বাঙালি মুসলীম লীগের রাজনীতিবিদ এবং কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী যারা উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো, অথবা বাংলার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন, তাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা

করা। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর প্রস্তাবের জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় (দৈনিক আজাদ ২ মার্চ ১৯৪৮)।[৩৪] এছাড়াও পত্র-পত্রিকায় ২৫শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে তীব্রভাবে পাকিস্তান সরকারকে সমালোচনা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য লেখালেখি চলে দৈনিক 'আজাদ' 'ইত্তেহাদ' সাপ্তহিক 'নও বেলাল' (পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা) এবং 'আনন্দবাজার' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকাতেও বাংলাভাষার পক্ষে এবং পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করে বিভিন্ন লেখা বের হতে থাকে।

জণগণের এই আন্দোলনমুখী চেতনাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী সংগঠনের। এই কথা বিবেচনা করে ফজলুল হক হলে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সভা আয়োজন করা হয়। কমরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এই সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করা হয়। এ সভাতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এবং তমুদ্দিন মজলিসের যৌথ সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের গণপরিষদে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করা এবং নৌ বাহিনীতে নিযুক্তির পরীক্ষা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ১১ মার্চ (১৯৪৮ সাল) ঢাকাসহ সারাদেশে হরতালসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১১ মার্চের এই কর্মসূচি খুব বেশি লড়াকু ছিলো না। পূর্বেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রথমদিকে এই আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রসমাজ এবং মুষ্টিমেয় কিছু রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। সাধারণ জনতার এ নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিলো না, এমনকি সাধারণ জনতা এ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে তথা পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলন হিসেবে দেখতো। এ কারণে দেখা গেছে ছাত্ররা ভাষার দাবীতে মিছিল বের করলে ঢাকার নবাবপুর রেলক্রসিং পার হলেও জনতা ছাত্রদের মিছিলে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতো। তারপরেও সরকার এই কর্মসূচি বানচালে কঠোর অবস্থান নেয়। নিরস্ত্র ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায়। প্রায় ২০ জন ছাত্র আহত হয় (আনন্দবাজার, ১২ মার্চ ১৯৪৮)। সেদিনের ঢাকায় পিকেটিং এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, নইমুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোহা প্রমুখ। এঁদের সবাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নেতাদের গ্রেফতারের পরেও আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাতে আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কেননা, ১৫ মার্চ ছিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেন। কেননা পকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর অত্যাসন্ন। যেকোনো মূল্যে তাঁর সফরকে নিরুপদ্রব করতেই হবে। এমনিতেই আজিজ আহম্মেদ জিন্নাহর কাছে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত নেতিবাচক রিপোর্ট করতেন। তার উপর এখানে এসে যদি

দেখেন যে, পূর্ববাংলায় ছাত্র আন্দোলন দমন করতে তিনি ব্যর্থ, তাহলে তাঁর উপর গভর্নর নাখোশ হতে পারেন। তা ছাড়া মি. জিন্নাহ নাজিমুদ্দিনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ঢাকায় আসার আগেই যেন তিনি ছাত্রদের সাথে ভাষার গণ্ডগোল মীমাংসা করেন। তার ওপর সামনে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। এসব কারণে তিনি সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি সমঝোতায় যেতে চাইলেন। মূলত এই সমঝোতা ছিলো আপদকালীন সমস্যা মোকাবিলা করার একটা কৌশলমাত্র। ১৫ তারিখ সকাল ১১ টায় সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের আলোচনা হয়, নানা তর্ক-বিতর্কের পরে ৮ (আট) দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলে আটক নেতাদের চুক্তির দফাগুলোর' ব্যাপারে তাঁদেরকে অবহিত করে সমর্থন নেয়া হয়।

চুক্তির ধারাগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিলো আন্দোলনে ধৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি, পুলিশি অত্যাচারের ব্যাপারে তদন্ত, পূর্ববঙ্গ আইন সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব পাশ এবং তা গণপরিষদে পাশ করানোর চেষ্টা, প্রদেশের সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ, কলকাতা থেকে আসা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ, ১৯৪৮ অপরাহ্নে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন। জাতির পিতার উপস্থিতি উপলক্ষে হাজার হাজার জনতা রেসকোর্স থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ভিড় করে থাকলেও তাদের মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস ছিলো না। ছাত্ররা ছিলো নিরুৎসাহ।

২১শে মার্চ, অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তিনি বক্তৃতা করেন । তাঁর বক্তৃতায় ভাষা নিয়ে বলেন–

> 'আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্যকোন ভাষা নয়। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত কোন জাতির সংহতি থাকিতে পারে না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের প্রতি তাকাইয়া দেখুন। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে রাষ্ট্রের শত্রু। আমি আবারো বলিতেছি যে, পাকিস্তানের শত্রুদের ফাঁদে পা দেবেন না। দুর্ভাগ্যবশত আপনাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী রহিয়াছে। পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য। আমি আপনাদের পঞ্চম বাহিনীর ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি, না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন। মুসলিম লীগ আপনাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত।'[৩৫]

মি. জিন্নাহর ঐ দিনের এক ঘণ্টা যাবৎ দেয়া বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা এরূপ–

জাতিসত্তার মূল ভিত্তি হলো ভাষা। পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে বাঙালির জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়। ভাষাকে জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে মেনে নিলে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের আর কোনো মূল্য থাকে না। এ কারণে মি. জিন্নাহ ওই দিনের বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেন

যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্যকোনো ভাষা নয়। তা না হলে মেনে নিতে হবে বাঙালির কর্তৃত্ব। কিন্তু বাঙালির কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য জিন্নাহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করেনি। বক্তব্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পশ্চিমা শাসকরা সব সময় বাঙালির যৌক্তিক আন্দোলনকে কমিউনিস্ট এবং ভারতের পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে পূর্ববাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। জিন্নাহর বক্তব্যে সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। যাহোক ছাত্রসমাজ তথা সাধারণ জনগণ তাঁর বক্তব্য মেনে নেয়নি। বিশেষ করে ভাষা নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সাথে সাথে 'না...না' ধ্বনির প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।

২১শে মার্চের বক্তব্যের কারণে মি. জিন্নাহ পূর্ববাংলার জনগণের শ্রদ্ধা অনেকাংশে হারান। সাথে সাথে ছাত্রদের একাংশ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ২৪শে মার্চ সকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এ দিনেও তিনি পঞ্চম বাহিনী, ভারতের শত্রুতা, পাকিস্তানের সংহতির জন্য মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ভাষার ব্যাপারে এদিনেও অনমনীয় মনোভাব 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহ যে এ ধরনের বক্তৃতা দেবেন সেটা ছাত্ররা জানতো, ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনসহ অন্যান্য ছাত্ররা 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তখন জিন্নাহ তাঁর কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রনায়ক থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে এসে বলেন, "এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।"[৩৬]

এ দিনে তিনি বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে যেভাবে বক্তব্য দেন, তাতে সহজেই পূর্ববাংলার জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি বলেন–

> "আমাদের দুশমনেরা পাকিস্তানকে দুর্বল করার আশায় প্রাদেশিকতা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠিয়াছে এবং এইভাবে আপনাদের প্রদেশকে পুনরায় ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই শত্রুদলের মধ্যে এখন পর্যন্ত কতকগুলি মুসলমান রহিয়াছে। যারা এই খেলা খেলিতেছে তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করিতেছে। এই প্রদেশে মুসলমানদের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য জনসাধারণকে অরাজকতার উস্কানি দেওয়ার জন্য প্রত্যহ মিথ্যা প্রচারণার বন্যা প্রবাহিত হইতেছে।" [৩৭]

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কতকগুলি পত্রিকার নাম উল্লেখ না করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> "আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয় না যে, ভারত ডোমিনিয়নের কতকগুলো সংবাদপত্র, যাহাদের নিকট পাকিস্তান নামটিই অশুভ, ভাষার বিতর্কে তাহারাই আজ আপনাদের পক্ষালম্বন করিয়াছে এবং উহাকে 'আপনাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার' বলিয়া অভিহিত করিতেছে। অতীতে যাহারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তাহারাই আজ হঠাৎ আপনাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ত্রাণকর্তা হইয়া উঠিয়াছে এবং ভাষার

ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে অমান্য করার উস্কানি দিতেছে অথচ এই পাকিস্তান হইতেছে আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মূল ভিত্তি। ইহাদের এইসব ভূমিকার কোন তাৎপর্য নেই।"[৩৮]

বাংলাদেশে মি. জিন্নাহর এই প্রথম এবং শেষ সফর বাঙালির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত মাসের মধ্যেই বাঙালির পাকিস্তানের রাষ্ট্রের প্রতি মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। সফরকালে জিন্নাহের বক্তব্য শিক্ষিত বাঙালির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পাকিস্তান কাদের জন্য, পাকিস্তান কেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির ভবিষ্যৎই বা কী? জিন্নাহের ঢাকা ত্যাগের সাথে সাথে বাংলা ভাষা আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে তবে স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

যে উর্দুর প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এত দরদ, সেই উর্দুর জন্মের ইতিহাস যদি আমরা খুঁজি তাহলে দেখবো- উর্দু উপমহাদেশের কোনো ভাষা নয়, এটি একটি শেকড় বিহীন ভাষা। উর্দুর জন্ম তুর্কি সেনাদের ছাউনিতে। তুর্কি ভাষায় উর্দু শব্দের অর্থ সিপাহি, লস্কর বা বরকন্দাজ। বাদশাহী আমলে দিল্লিতে রাজভাষা ফারসির সাথে বিভিন্ন তুর্কি সেনাদের শিবিরে সিপাহিদের মুখে মুখে আরেকটি কথ্যভাষার জন্ম হয়, সেটি হচ্ছে উর্দু ভাষা। অর্থাৎ উর্দিদের মুখে মুখে যে ভাষার জন্ম তাই উর্দু ভাষা। হিন্দি এবং উর্দুর মধ্যে পার্থক্য শুধু হিন্দিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অধিক এবং লেখা হয় দেবনাগরী হরফে। অপরদিকে উর্দুতে আরবি-ফারসির প্রচুর ব্যবহার আর লেখা হয় আরবি হরফে। পরবর্তিতে সিপাহিদের মুখে সৃষ্ট এই মিশ্রভাষা মোঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণতা লাভ করে। ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এবং পূর্বেই বলা হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে উর্দু ভাষার চর্চা বেশ বেড়ে গিয়েছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত পরিবারগুলোর (বিশেষ করে উত্তর ভারতের) ভাষা হয়ে দাঁড়ায় উর্দু। তারা বাংলায় যেমন কথা বলতো না তেমনি লেখাপড়াও করতো না। উর্দু অভিজাতদের ভাষা এই ধারণা মুসলমানদের মনে পরবর্তী সময়ে বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামঝি সময়ে যাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির সাথে জড়িত ছিলো- তাঁরা নিজেদের অভিজাত বলেই ভাবতেন এবং তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন উর্দুভাষী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মতে, 'উর্দুই মুসলিম রাষ্ট্রভাষা'। অপরদিকে মন্ত্রী গজনফর আলী খান এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'উর্দু ভাষাই মুসলিম সংস্কৃতি'। অথচ দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে উর্দুর জন্ম-ইতিহাস সেটা বলে না।

আটচল্লিশের মার্চের আন্দোলনের পরে এবং বিশেষ করে জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফরে উর্দুর পক্ষে জোরালো অবস্থান, নাজিমুদ্দিনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অবৈধ ঘোষণার পরেও আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েনি। এ সময়ে দেশের অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, শিক্ষিত শ্রেণি থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষের ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং সরকারের রাজনৈতিক অনাচার ও দমননীতি একধরনের সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি করে। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই ভাষা আন্দোলন আবার নতুন প্রাণ লাভ করে। আটচল্লিশের যে আন্দোলন বাঙালিকে পথে নামিয়েছে,

বায়ান্নোর সেই আন্দোলনে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আরো নাম না জানা বহু বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। সেই রক্তের ধারা একাত্তরের সাথে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উপসংহার

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বাঙালি এক হাতে বাইরের শত্রুকে ঠেকিয়েছে অপর হাতে নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করেছে। আবার তাকে নিজের ঘরের শত্রু বিভীষণের সাথেও সমান তালে লড়তে হয়েছে। এ লড়াই শুরু হয়েছে আর্যদের আবির্ভাবের সাথে সাথে দুর্ধর্ষ আদিবাসীদের সাথে। এই ভূমি শাসিত হয়েছে সেন, আফগান, মোঘল, ইংরেজদের দ্বারা। অনেকে বণিক বেশে এসে রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেছে। বহিরাগতরা উন্নততর সভ্যতা, রণকৌশল, অস্ত্র এবং ষড়যন্ত্রের বলে এ দেশ জয় করতে পারলেও তাদের পরাজিত হতে হয়েছে এ দেশের সংস্কৃতির কাছে। কেননা এ অঞ্চলের জনগণ কখনো বিদেশিদের চাপিয়ে দেয়া ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি। সহ্য করেনি নিজ সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জনগোষ্ঠির অপমান। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে বারবার হয়েছে ঐক্যবদ্ধ, ছিনিয়ে এনেছে সাফল্যের মুকুট। এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিতে অবগাহন করে অনেকেই ধন্য হয়েছেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, উইলিয়াম জোন্স, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ও উইলিয়াম কেরি'র মতো ব্যক্তিদের কাছে বাঙালি আবার ঋণী, কৃতজ্ঞ। পরদেশিদের শাসনামলে রাজভাষা কখনও ছিল আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি। সুদীর্ঘ সময়ে তুর্কি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণে বাংলাভাষা হয়ে ওঠে বিশ্বসাহিত্যের এক রত্নভাণ্ডার।

বাংলার বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে সৃষ্ট এই ভাষা শত্রুর মুখোমুখি হয় তাদের রাজত্বকালের অবসানে। পালদের পরে বর্ণশ্রেষ্ঠ সেনদের আমলে বাংলা ধর্মরোষে পড়ে। কাজেই দেখা যায় হিন্দু রাজাদের আমলে ঘৃণিত বাংলা মুসলিম শাসনামলে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলো। হিন্দু, মুসলিম মিলে শুরু হল বাংলাভাষার সমৃদ্ধির কাজ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে সেই মুসলিম সম্প্রদায় যারা হিন্দু আমলের ঘৃণিত বাংলাভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলাভাষার সমৃদ্ধি করেছে তারাই বাংলাকে ঘৃণা করে বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উর্দু'র মোহে ছুটেছে। ততোদিনে এই বিশাল জনগোষ্ঠির মাঝে বাংলাভাষা এক শক্তিশালি অবস্থা করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাকে ভালোবেসে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন অনেকেই। সমস্ত অবজ্ঞা উপেক্ষা করে বিশ শতকের শুরুতে বাংলাভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয় করলেন সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক বৈশ্বিক পুরস্কার। বাংলাকে ঘৃণা করে, বাংলা নাপিত, জেলে, ধোপাসহ নীচ জাতির ভাষা বলে বাংলা ত্যাগ করে যিনি সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে লেখালেখি শুরু করলেন সেই বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও জীবনের শেষ বেলাতে বাংলাকে ভালোবেসে বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

ভালোবাসা ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে ভাষা সেই ভাষাকে বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে পাকিস্তানি অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদরা যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল, সেটা ছিল তাদের বোকামি। বাঙালি আবারো ঘুরে দাঁড়ালো, আবারো ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তাদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে বিপদমুক্ত করল। এবার অবশ্য বাঙালিকে ভাষার জন্য অনেক মূল্য দিতে হল। বয়ে গেল রক্তবন্যা, বহুপ্রাণের বিনিময়ে বাংলাভাষা পেল জীবন।

তথ্যসূত্র :

১. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১

২. নিগার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ১২

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২

৪. বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬০

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

১০. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

১১. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৫. নিগার চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

১৬. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৯. আহম্মদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

২০. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২০

২১. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭

২২. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

২৩. আহম্মদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

২৪. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯

২৫. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১
২৭. এম. আর. আখতার মুকুল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৬
২৮. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০
৩০. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১০
৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১০
৩৩. এম. আর. আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪
৩৪. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭
৩৫. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৩
৩৬. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০
৩৭. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮